পিপীলিকা-সাম্রাজ্য

এইচ জি ওয়েলস

পিপীলিকা-সাম্রাজ্য

(The Empire of the Ants)

['The Empire of the Ants' প্রথম প্রকাশিত হয় পত্রিকায় এপ্রিল ১৯০৫ সালে। আগস্ট ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয়' Amazing Stories' পত্রিকায়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'The Empire of the Ants and Other Stories' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান। পায়। ১৯৭৭ সালের 'Empire of the Ants' সিনেমাটি এই গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি।]

০১.

মহাসমস্যায় পড়েছেন ক্যাপটেন গেরিলো।

হুকুম এসেছে গানবোট বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট-কে নিয়ে যেতে হবে বাদামায়। পিঁপড়েরা মড়ক শুরু করেছে–লড়তে হবে তাদের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দারা সৈন্য-সাহায্য চায়।

হুকুমটা শুনে অব্দি ক্যাপটেনের ঘোর সন্দেহ হয়েছে, নিশ্চয় তাঁকে অপদস্থ করার চক্রান্ত এঁটেছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি তাঁর পদোন্নতি ঘটেছে এমন প্রক্রিয়ায়, যা ন্যায়সংগত মোটেই নয়। ক্যাপটেনের রোমান্টিক চোখের চাহনিতে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ এক মহিলা এমন কলকাঠি নেড়েছিলেন যে, পদোন্নতি কেউ আটকাতে পারেনি। তবে, দু-দুটো দৈনিকে তা ই নিয়ে বেশ টিটকিরি শোনা গেছে।

ক্যাপটেন গেরিলো জাতে পর্তুগিজ। আদবকায়দা আর নিয়মশৃঙ্খলার পরম ভক্ত। তাই মনের কথাটা পাঁচজনের কাছে ব্যক্ত করতে পারেননি। সমপর্যায়ের মানুষ না হলে কি প্রাণ খুলে কথা বলা যায়?

এমন একজনকে অবশেষে পাওয়া গেল গানবোটে। নাম তাঁর হলরয়েড–ল্যাঙ্কাশায়ার ইঞ্জিনিয়ার। চাপা বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর কাছে। এ কী উদ্ভট কাণ্ড? মানুষ বনাম পিঁপড়ে? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? পিঁপড়ে আসে পিলপিল করে, মানুষের তাতে বয়ে গেল। খামকা লড়তে যাবে কেন?

ইঞ্জিনিয়ারমশায় জবাব দিয়েছিলেন, আমি তো শুনেছি, এই পিঁপড়েরা পিলপিল করে আসে বটে, কিন্তু চলে যায় না। সাম্বো বলছিল–

সাম্বো নয়–জাম্বো। দোআঁশলা।

সাম্বো, ইঞ্জিনিয়ারের জিবের জড়তা সত্যিই অদ্ভুত। ধরিয়ে দিলেও সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না। সাম্বো বলছিল, পিঁপড়েরা কিন্তু যাচ্ছে না–পিলপিল করে পালাচ্ছে মানুষরাই।

রাগের চোটে অনর্গল ধূমপান করে গেলেন ক্যাপটেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, অসম্ভব। পিঁপড়ে মড়ক ছড়ায়–তার পেছনে থাকে ভগবানের হাত। পিঁপড়েরা নিমিত্তমাত্র। ত্রিনিদাদে খুদে পিঁপড়েরা এইরকম মহামারী ডেকে এনেছিল। কমলা গাছ আর আম গাছের পাতা মুখে করে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে বাড়ির মধ্যেও হামলা করে পিঁপড়েরা লড়াকু পিঁপড়ে–আরশোলা, মাছি, উকুন মেরে বাড়ি সাফ করে দিয়ে চলে যায়। ভালোই করে।

সাম্বো বলছিল, এই পিঁপড়েরা একেবারেই অন্য ধরনের।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সিগারেট নিয়ে তন্ময় হলেন ক্যাপটেন। মুখ খুললেন কিছুক্ষণ পরে, গোল্লায় যাক পিঁপড়ে। আমি তার কী করব? লড়ব কামান-বন্দুক নিয়ে? যত্তসব।

বিকেল নাগাদ কিন্তু পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে নেমে গেলেন তীরে। অনেক বয়েম আর বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন গানবোটে।

ডেকে বসে রইলেন হলরয়েড। ব্রাজিলের মহাবনের দৃশ্য বাস্তবিকই অপরূপ। সিগারেট টানতে টানতে পড়ন্ত বিকালের ঠান্ডা বাতাসে দুচোখ দিয়ে উপভোগ করলেন সেই দৃশ্য। ছদিন হল অ্যামাজন দিয়ে চলেছে গানবোট। সমুদ্র থেকে চলে এসেছে কয়েকশো মাইল দূরে। পূর্ব আর পশ্চিমের দিক্‌রেখা কিন্তু সমুদ্রের মতোই। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে প্রায় নেড়া একটা বালির চড়া দ্বীপ–সামান্য কিছু আগাছা ছাড়া কিছুই নেই সেই দ্বীপে। কাদা-ঘোলা খরস্রোতা জলে ভেসে যাচ্ছে গাছের গুঁড়ির পাশে কুমির-পাখি উড়ছে জলের ওপর। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে আলেমকুর শহরের একটিমাত্র গির্জে-সাহারা মরুভূমির মাঝে যেন একটিমাত্র ছপেনি মুদ্রা। উদ্দাম সবুজ বনানীর মাঝে আর কোনও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। মানুষ যে কত নগণ্য প্রকৃতির এই বিশালতার মধ্যে, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করছেন ইঞ্জিনিয়ার। বয়সে তরুণ। শিক্ষাদীক্ষা ইংল্যান্ডে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এসেছেন এই প্রথম। এই ছদিনে দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির মতোই এক-আধবার দর্শনলাভ ঘটেছে মানুষ নামক প্রাণীটার। একদিন দেখেছেন একটা ক্যানো, আর একদিন বহু দূরের একটা স্টেশন, তারপর থেকে মানুষের টিকিও আর দেখেননি। বিশাল এই ভূখণ্ডে

মানুষ যে একটা দুষ্প্রাপ্য জন্তু এবং পাত্তা পাচ্ছে না মোটেই, এই ধারণাটাই শেকড় গেড়ে বসেছে মনের মধ্যে।

যত দিন যায়, ততই ধারণাটা বদ্ধমূল হতে থাকে। কামানবাজ কমান্ডারের কাছ থেকে স্প্যানিশ ভাষা রপ্ত করছেন অসীম ধৈর্য সহকারে। ইংরেজিতে কথা বলার মতো লোক। আছে একজনই–একটা নিগ্রো ছোকরা–চুল্লিতে কয়লা দেওয়া তার কাজ। ভুল ইংরেজি বললেও কথাবার্তা চালিয়ে নেওয়া যায় কোনওমতো সেকেন্ড কমান্ডার দা কুন্‌হা জাতে পর্তুগিজ। ফরাসি ভাষা জানে–কিন্তু অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে। আবহাওয়া সম্পর্কে সৌজন্যমূলক দু-একটা বাক্যবিনিময় ছাড়া আর কথা হয় না। কাজেই প্রাণ খুলে বলার লোক ওই একজনই–ক্যাপটেন গেরিলো।

আবহাওয়াও অতি যাচ্ছেতাই। আশ্চর্য এই নবীন দুনিয়ার আবহাওয়াও এমন আশ্চর্য হবে, কে জানত। দিনেরাতে সমান গরম। বাতাস তো নয়, যেন গরম বাষ্প। পচা গাছ পাতার গন্ধে ভরপুর। কুমির, অদ্ভুত পাখি, নানা রকমের পতঙ্গ আর আকাশের মাছি, গুবরেপোকা, পিঁপড়ে, সাপ আর বাঁদররা পর্যন্ত যেন বিস্মিত ভয়াবহ এই আবহাওয়ায়। মনুষ্য নামক সুখী প্রাণীর আবির্ভাব দেখে। কী গরম! কী গরম! গায়ে পোশাক রাখা যায় না, খুলে ফেলাও যায় না–রোদ্দুরে চামড়া ঝলসে যায়। রাত্রে এক ধরনের মশা এসে কামড়ায় গায়ে পোশাক না থাকলে। দিনের বেলায় ডেকে উঠলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় জ্বলন্ত সূর্যের কিরণে–যেন দম আটকে আসতে থাকে। দিনের বেলাতেও পোকামাকড়ের সে কী উৎপাত। এক ধরনের ধড়িবাজ মাছি এসে কামড়ায় গোড়ালি আর কবজিতে।

ক্যাপটেন গেরিলোর সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি। বান্ধবীদের গল্প ছাড়া আর কোনও কথা নেই তাঁর মুখে। মাঝে মাঝে তাঁরই উৎসাহে কুমির শিকার করে কিছুটা সময় কাটানো গেছে। বনের মধ্যে লোকালয় দেখে নেমে গিয়ে ক্রিয়ল মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ নাচানাচিও হয়েছে। এ ছাড়া এই ছদিনে আর কোনও বৈচিত্র নেই।

ক্যাপটেন গেরিলো কিন্তু পিঁপড়ে সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝেই গানবোট থামিয়ে নেমে যাচ্ছেন এবং একটু একটু করে এই বিচিত্র অভিযানে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

একদিন তো স্বীকার করেই বসলেন, পিঁপড়েগুলো নাকি একেবারেই নতুন ধরনের আলাদা জাতের। কীটতত্ত্ববিদরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যাবেন বিশেষ এই পিঁপড়েদের চেহারা চরিত্রের বর্ণনা শুনলে। লম্বায় পাক্কা পাঁচ সেন্টিমিটার! ভাবা যায়? আরও বড় আছে! হোক গে অতিকায়, তা-ই বলে কি বাঁদরের মতো পোকা খুঁটতে যেতে হবে? ছ্যা ছ্যা! তবে হ্যাঁ, দানবিক এই পিঁপড়েরা নাকি গোটা তল্লাটটাকে পেটে পুরতে বসেছে। পুরুক গে, পিঁপড়েদের যদি খিদে পায়, রণকুশল ক্যাপটেন কি কামান-বন্দুক নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে? লোকে হাসবে না? এই সময়ে ইউরোপে যদি লড়াই লেগে যায়? ক্যাপটেন গেরিলো তখনও কি মহাবিক্রমে পিপীলিকা নিধন চালিয়ে যাবে? ভাবতেও গা রি-রি করে!

এটা ঠিক যে, পিঁপড়ে-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে রিও নিগ্রোতে। নাচের আড্ডায় ওই যে মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল, ওরাও তো সব খুইয়ে পালিয়ে এসেছে। একদিন নাকি বিকেল নাগাদ পালে পালে হানা দিয়েছিল পিঁপড়েরা। বাড়িঘরদোর ছেড়ে চম্পট

দিয়েছিল প্রতিটি মানুষ। নইলে তো পিঁপড়ের পেটেই যেতে হবে। তাই পিঁপড়ে এলেই পালায়, পরে ফিরে আসে। একজন এসেছিল সবার আগে। ওরে বাবা! দেখে কী, ঘরদোর দখল করে বসে রয়েছে পিঁপড়েরা–কেউ যায়নি। তাকে দেখেই আরম্ভ করে দিলে লড়াই! মানুষের সঙ্গে পিঁপড়ের লড়াই!

লড়াই মানে সারা গায়ে উঠে পড়েছিল, এই তো?... বলেছিলেন হলরয়েড।

কামড়ে পাগল করে দিয়েছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঁপড়েদের ডুবিয়ে মেরেছিল। নিজেও কিন্তু মারা গিয়েছিল সেই রাতেই–ঠিক যেন সাপের কামড়ে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল রক্তের মধ্যে?

বলেন কী! পিঁপড়ে বিষ ঢালতে পারে?

ঈশ্বর জানেন। হয়তো খুব বেশি কামড়েছিল। তবে কী জানেন, লড়াই বিদ্যেটা শিখেছি মানুষ মারার জন্যে, পিঁপড়ে মারার জন্যে নয়।

এরপর থেকে প্রায় পিঁপড়ে-পুরাণ নিয়ে আলোচনা হত দুজনের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দারা নাকি এই বিশেষ পিঁপড়েদের নাম দিয়েছে সৌবা। বিশাল এই অরণ্যকে পদানত করতে চলেছে সৌবারা!

পিঁপড়েদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ছেড়ে দিয়েছেন ক্যাপটেন গেরিলো। পিঁপড়ে জাতটা সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল তিনি। যে পিঁপড়েরা শুধু গাছের পাতা কাটে, তাদের খবর জেনেই এতদিন অনেক বড়াই করেছেন। কর্মীরা আকারে ছোট, পিলপিল করে ছড়িয়ে

পড়ে, প্রাণ দিয়ে লড়ে যায়। বড় সাইজের কর্মীরা হুকুম দেয়, শাসন করে, তবে এই শেষোক্ত পিঁপড়েরা যদি চড়াও হয় কারও ওপর, তাহলে গুটিগুটি সটান উঠে যায় ঘাড়ে আর কোথাও নয়–কামড়ে রক্ত টেনে নেয়। পাতা কেটে শেওলার বিছানা বানিয়ে নেয় এই শ্রেণির পিঁপড়েরা। কয়েকশো গজ পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে এদের বাসাবাড়ি।

পিঁপড়েদের চোখ আছে কি না, এই নিয়ে পুরো দুটো দিন দারুণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। দ্বিতীয় দিনে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হতে হলরয়েড তীরে নেমে গিয়ে বেশ কিছু পিঁপড়ে পাকড়াও করে এনে দেখালেন, কিছু পিঁপড়ের চোখ আছে, কারও কারও নেই।

তারপরেই ঝগড়া লাগল নতুন বিষয় নিয়ে। পিঁপড়েরা কামড়ায়, না হুল ফোঁটায়?

গোরু-মোষ চরানোর একটা বিস্তীর্ণ জমিতে নেমে এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন গেরিলো।

বললেন, বিশেষ এই পিঁপড়েদের নাকি ড্যাবডেবে চোখ আছে। অন্য পিঁপড়েদের মতো অন্ধ নয়–সেইভাবে চলাফেরাও করে না। আড়ালে-আবডালে ড্যাবডেবে চোখ মেলে ওৎ পেতে বসে থাকে।

হুল ফোঁটায় নিশ্চয়?

হ্যাঁ, ফোঁটায়। বিষ আছে ওই হুলেই।

অন্য পিঁপড়েদের মতো চড়াও হওয়ার পর চলে যায় না–ঘাঁটি আগলে থেকে যায়।

তা ঠিক।

তামান্দু পেরিয়ে আসার পর প্রায় আশি মাইল পর্যন্ত তীরভূমিতে মানুষের বসতি একেবারেই নেই। তারপরেই নদী আর ততটা চওড়া নয়, দুপাশের জঙ্গল ক্রমশ কাছে এগিয়ে এসেছে। সেই রাতে একটা ঝুপসি গাছের গাঢ় ছায়ায় নোঙর ফেলল বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট। অনেকদিন পরে শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল প্রত্যেকেরই। পরমানন্দে ডেকে বসে চুরুট খেয়ে গেলেন গেরিলো আর হলরয়েড।

গেরিলোর মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরছে আজব এই পিঁপড়েদের কথা। আতঙ্ক ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত বেটাচ্ছেলেরা কী করে বসবে, তা-ও তো আঁচ করা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে হাল ছেড়ে দিয়ে মাদর পেতে ঘুমিয়ে পড়লেন ডেকের ওপরেই।

মশার কামড়ে ফুলে-ওঠা কবজি রগড়াতে রগড়াতে বসে রইলেন হলরয়েড। তাঁর মাথাতেও হাজারো চিন্তার জট। বনের বিশালতা এই কদিনেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাঁকে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন রহস্যময় জঙ্গলের দিকে। মাঝে মাঝে জোনাকির আলোয় আলোকিত নিবিড় তমিস্রার মধ্যে শোনা যাচ্ছে যেন ভিনগ্রহীদের গুঞ্জন রহস্যনিবিড় তৎপরতায় চঞ্চল যেন অন্ধকারের দেশ!

বনভূমির এই অমানবিক বিশালতায় তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং বিমর্ষ। হলরয়েড জানেন, আকাশে মানুষ নেই, অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড মহাশূন্যে ধূলিকণার মতো ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত নক্ষত্র; তিনি জানেন, মহাসমুদ্রের বিশালতায় মানুষ বিমূঢ় এবং পরাভূত। সমুদ্র শাসন

করতে না পারলেও স্থলভূমিকে কবজায় এনেছে ভালোভাবেই। শুধু ইংল্যান্ড কেন, পৃথিবীর যেখানে যত ডাঙা আছে, মানুষের বিজয়কেতন উড়ছে সর্বত্র। এই বিশ্বাস ছিল ইংল্যান্ড ছেড়ে আসার আগে।

কিন্তু রহস্য থমথমে এই বনানী তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে। এখানে মানুষ পরাজয় স্বীকার করেছে। এখানে তার বিজয়কেতন ওড়েনি। এখানকার মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ বনভূমিতে বীরদর্পে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে পোকামাকড়, কচ্ছপ, কুমির, পক্ষী, বিশাল মহীরুহ আর অজগরসম লতার জটাজালের মধ্যে–নেই শুধু মানুষ। দু-একজন চেষ্টা চালিয়ে হার মেনেছে। সাপ, পোকা, পশু আর জ্বরের খপ্পরে প্রাণ দিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গলে দেখা গেছে পরিত্যক্ত গ্রাম, ভেঙেপড়া সাদা দেওয়াল, মিনারের ভগ্নস্তূপ। পুমা আর জাগুয়ারই এই মহাবনের প্রভু–মানুষ নয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রভু কে?

পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ আছে, তার চাইতেও বেশি সংখ্যক পিঁপড়ে আছে এই জঙ্গলের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে! চিন্তাটা মাথার মধ্যে আসতেই অন্য চিন্তায় পেয়ে বসে হলরয়েডকে। বর্বর মানুষ কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় সভ্য হয়েছে। পিঁপড়েদের ক্ষেত্রেও যে এই ধরনের ক্রমবিবর্তন আসবে না, তা কি কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে? হাজার হাজার দলবদ্ধ পিঁপড়ে বৃহত্তর বহির্জগৎ নিয়ে এতাবস্কাল মাথা ঘামায়নি ঠিকই। কিন্তু মাথা ঘামানোর মতো বুদ্ধিমত্তা তাদের আছে, আছে নিজস্ব ভাষা! বর্বর মানুষ আদিম অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে, পিঁপড়েরাই বা তা পারবে না কেন? মানুষ

যেমন পুঁথি আর নথির মধ্যে জ্ঞান সংগ্রহ করে বানিয়েছে হাতিয়ার, গড়েছে বিশাল সাম্রাজ্য, ঘটিয়েছে পরিকল্পনামাফিক সংগঠিত যুদ্ধ–পিঁপড়েরাই বা তা পারবে না কেন?

গেরিলো অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন বিশেষ এই পিঁপড়েদের সম্পর্কে। সাপের বিষের মতোই বিষ ব্যবহার করে এই পিপীলিকাবাহিনী। পাতা-কাটিয়ে পিঁপড়েদের চাইতেও তারা হুকুম মেনে চলে আরও বড় দলপতির। মাংস খায়, এবং যে জায়গা দখল করে, তা দখলেই রাখে, ছেড়ে দিয়ে চলে যায় না...

বনভূমি নিথর। জাহাজের গায়ে বিরামবিহীনভাবে জল আছড়ে পড়ছে। মাথার ওপরে লণ্ঠন ঘিরে উড়ছে প্রেতচ্ছায়ার মতো মথোকা।

অন্ধকারে নড়ে উঠলেন গেরিলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঘুমের ঘোরে, কে জানে, কী করে বসে।

দুঃস্বপ্ন দেখছেন নিশ্চয়!

.

০২.

পরের দিন বাদামার চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছেন শুনে তীরভূমি সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পেল হলরয়েডের। ডেকে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন সুযোগ-সুবিধে পেলেই আশপাশের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার মতলবে। মানুষের চিহ্ন কোথাও দেখতে

পেলেন না। দেখলেন কেবল আগাছায় ছাওয়া একটা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ, আর একটা শেওলা-সবুজ দীর্ঘ পরিত্যক্ত মঠের সামনের দিকশূন্য গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে একটা অরণ্য বৃক্ষ এবং মোটা মোটা লতার জটাজালে ঢেকে গেছে দুহাট করে খোলা প্রবেশপথ। অদ্ভুত হলুদ রঙের এক রকমের প্রজাপতি বেশ কয়েকবার নদী পারাপার করল সেদিন–ডানা তাদের অর্ধস্বচ্ছ। জাহাজে নেমে পড়ল কিছু নিহত হল তৎক্ষণাৎ। বিকেলের দিকে দেখা গেল একটা বড় ক্যানো। পরিত্যক্ত।

অথচ পরিত্যক্ত বলে মনে হয়নি প্রথমে। দুটো পালই শিথিলভাবে ঝুলছে প্রশান্ত হাওয়ায়। সামনের গলুইতে বসে রয়েছে একটি মনুষ্যমূর্তি। আর-একটা লোক যেন উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেভাবে এগিয়ে এল ক্যানোটা গানবোটের দিকে, দেখেই খটকা লাগল প্রত্যেকেরই। দূরবিন কষে গেরিলা বসে-থাকা লোকটির দিকে চেয়ে ছিলেন। বিচিত্র আলো-আঁধারির মাঝে মনে হল যেন ঝুঁকে রয়েছে–বসে থাকা বলতে যা বোঝায় তা নয়। লাল মুখ, নাক নেই। একবার দেখেই আবার দেখবার শখ উবে গেল। অথচ চোখ থেকে দূরবিন নামাতে ইচ্ছে হল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরবিন নামিয়ে হলরয়েডকে ডাকলেন। ভাসমান ক্যানোর লোকজনকেও হেঁকে ডাক দিলেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখলেন ক্যানোর গায়ে লেখা নামটা-সান্তারোজা।

গানবোট পাশ দিয়ে যেতেই ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলে উঠেছিল সান্তালরাজা। ঝুঁকে-থাকা লোকটা অকস্মাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে। খসে পড়ল টুপি। প্রতিটি অস্থিসন্ধি যেন

খুলে আলগা হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে–কাত হয়ে পড়ল দেহটা–সেই সময়ে পলকের জন্যে দেখা গেল মুখখানা!

ভয়াবহ সেই মুখাকৃতি দেখলেই নাকি গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়!

কারাম্বা! বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গেরিলো। হলরয়েড পাশে এসে দাঁড়াতেই বলেছিলেন, দেখেছেন?

মরে ভূত হয়ে গেছে! ক্যাপটেন, নৌকা পাঠান ক্যানোয়–কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে।

মুখখানা দেখেছিলেন?

কীরকম দেখতে বলুন তো?

কী করে বলি?... কী করে বলি?... ভাষা নেই বোঝাবার! বলেই আচমকা হলরয়েডের দিকে পিছন ফিরে প্রচণ্ড হাঁকডাক দিয়ে ক্যাপটেনগিরি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন গেরিলো।

স্থলিত ভঙ্গিমায় ভেসে যাওয়া বড় ক্যানোর পাশাপাশি চলে এসেছিল গানবোট। নৌকো নামিয়ে রওনা হয়েছিল লেফটেন্যান্ট দা কুনহা আর তিনজন নাবিক। কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলেন গেরিলো। গানবোটকে নিয়ে এসেছিলেন ক্যানোর একদম পাশে। ফলে, লেফটেন্যান্ট নৌকোয় ওঠবার পর, সান্তারোজার সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হলরয়েড।

সুস্পষ্ট দেখলেন, অত বড় ক্যানোর আরোহী বলতে শুধু এই দুটি লোক। মুখ দেখতে না পেলেও সামনে ছড়িয়ে-থাকা হাত দেখে গা শিরশির করে উঠেছিল। অদ্ভুত পচন ধরেছে হাতে। দগদগে ঘা আর মাংস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার! হুমড়ি খেয়ে পড়ে-থাকা এই দুটি মনুষ্যদেহের পেছনে উন্মুক্ত খোলের মধ্যে স্তূপীকৃত ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স। কেবিনের দরজা খোলা। কেউ নেই ভেতরে।

মাঝখানের ডেকে সঞ্চরমাণ অনেকগুলো বিন্দুবৎ কালো বস্তু দেখেই গা কীরকম করে উঠেছিল হলরয়েডের। চোখ সরাতে পারেননি। বিন্দুগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে হুমড়ি খেয়ে পড়া লোকটার চারপাশ থেকে। ঠিক যেন মোষের লড়াই দেখছিল কাতারে কাতারে মানুষ –পালাচ্ছে বাগড়া পড়ায়।

বলেছিলেন গেরিলোকে, ক্যাপো, দুরবিন কষে পাটাতনগুলো ভালো করে দেখুন তো।

চেষ্টা করেছিলেন গেরিলো। হাল ছেড়ে দিয়ে দূরবিন তুলে দিয়েছিলেন হলরয়েডের হাতে।

খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে দূরবিন ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন হলরয়েড, পিঁপড়ে!

নিছক পিঁপড়ে। কুচকুচে কালো পিঁপড়ে। কাতারে কাতারে অতিকায় পিঁপড়ে। দেখতে সাধারণ পিঁপড়ের মতোই-সাইজে কিন্তু বিরাট। কয়েকটার পরনে ধূসর পোশাকও রয়েছে যেন।

ক্যানোর পাশে নৌকো নিয়ে গিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। গানবোট থেকে হুকুম দিয়েছিলেন গেরিলোক্যানোয় উঠতে হবে, এখুনি।

আপত্তি জানিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। ক্যানো থুকখুক করছে পিঁপড়েতে। ওঠেন কী করে?

পায়ে বুটজুতো আছে তো? ধমক দিয়ে উঠেছিলেন গেরিলো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে লেফটেন্যান্ট জানতে চেয়েছিলেন, লোক দুটো মারা গেল কীভাবে?

দারুণ কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে। একবর্ণও বুঝতে পারেননি হলরয়েড। দূরবিনটা গেরিলোর হাত থেকে নিয়ে ভালো করে ফোকাস করে দেখেছিলেন পিঁপড়েদের। আর, মড়া দুটোকে।

দেখেছিলেন বলেই, অদ্ভুত পিঁপড়েদের আশ্চর্য নিখুঁত বর্ণনা উপহার দিতে পেরেছিলেন আমাকে।

এত বড় পিঁপড়ে নাকি জীবনে দেখেননি। মিশমিশে কালো গায়ের রং। চলাফেরা রীতিমতো শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সাধারণ পিঁপড়েদের মতো যান্ত্রিক নয়–যেন বুদ্ধি দ্বারা চালিত। প্রায় প্রতি কুড়িটা পিঁপড়ের মধ্যে একটা আয়তনে আরও বড়–মাথা অস্বাভাবিক রকমের বৃহৎ। গেরিলোর বচনমালা মনে পড়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। পাতা-কাটিয়ে পিঁপড়েদের মধ্যেও নাকি দলপতি কর্মী থাকে। হুকুম দেয় সে। বিরাটমস্তিষ্ক এই পিঁপড়েগুলোও হুকুম দিয়ে সংহত এবং সংঘবদ্ধ রেখেছে পিঁপড়েবাহিনীকে। শরীর

বাঁকাচ্ছে অদ্ভুতভাবে–যেন চার পা ব্যবহারে অভ্যস্ত। পরনে রয়েছে যেন বিচিত্র ধূসর পোশাক–সাদা ধাতুর সুতোর মতো উজ্জ্বল শ্বেতপটির কোমরবন্ধনী দিয়ে পোশাক আটকানো রয়েছে গায়ে।...

অন্তত হলরয়েডের তা-ই মনে হয়েছিল। যাচাই করার সুযোগ পাননি।

গেরিলা আর লেফটেন্যান্টের মধ্যে বাগযুদ্ধ চরমে ওঠায় নামিয়ে নিয়েছিলেন দূরবিন।

কড়া গলায় ধমকে উঠেছিলেন গেরিলো, আমার হুকুম... আপনার ডিউটি... উঠুন ক্যানোয়।

বেঁকে বসেছেন লেফটেন্যান্ট। ঘিরে দাঁড়িয়েছে মুলাটো নাবিকরা। তারাও ক্যানোয় উঠতে নারাজ।

ইংরেজিতে বলেছিলেন হলরয়েড, লোক দুটোকে মেরেছে কিন্তু পিঁপড়েরা।

ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন ক্যাপটেন। হলরয়েডের কথার জবাব দেননি। গলার শির তুলে আতীক্ষ কণ্ঠে পর্তুগিজ ভাষায় হুকুম দিয়েছিলেন অধস্তন কর্মচারীদের, ক্যানোয় উঠতে হুকুম দিয়েছি, খেয়াল রাখবেন। যদি না ওঠেন–তাহলে বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে আপনাকে আপনার সঙ্গে যারা যারা রয়েছে–তাদেরকেও। ভীরু কোথাকার! লোহার শেকলে বেঁধে কুকুরের মতো গুলি করে মারব বলে দিলাম।

সে কী গালাগাল! তাণ্ডবনাচ নাচতে লাগলেন উন্মত্ত ক্রোধে। মুষ্টি পাকিয়ে নাড়তে লাগলেন মাথার ওপর। অপরূপ সেই মূর্তি দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লেফটেন্যান্ট মুখ নিরক্ত! নাবিকরা স্তম্ভিত!

আচম্বিতে মনস্থির করে ফেললেন লেফটেন্যান্ট। বীরোচিত সিদ্ধান্ত নিলেন। কাষ্ঠদেহে গটগট করে উঠে গেলেন ক্যানোয়। সঙ্গে সঙ্গে দুরকলে দরজা পড়ে যাওয়ার মতো ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাপটেনের অবিশ্রান্ত গালিগালাজ। হলরয়েড দেখলেন, দা কুহার বুটজুতোর পাশ থেকে পিছু হটে যাচ্ছে পিঁপড়েরা। মন্থর চরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে-থাকা লোকটার পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন লেফটেন্যান্ট। দ্বিধায় পড়লেন যেন। তারপর কোট খামচে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পিঁপড়ের ধারাস্রোত বয়ে গেল জামাকাপড়ের ভেতর থেকে। লাফিয়ে পিছিয়ে এলেন দা কুনহা। বারকয়েক জোরে পা ঠুকলেন ডেকে।

চোখে দূরবিন লাগালেন হলরয়েড। দেখলেন আগন্তুক দা কুহার পায়ের গোড়ায় বিক্ষিপ্ত পিঁপড়েদের। আর যা দেখলেন, তা তিনি জীবনে দেখেননি।

দৈত্যের পানে ঘাড় বেঁকিয়ে যেমন খুদে মানুষরা তাকিয়ে থাকে, অগুনতি কালো পিঁপড়ে ঠিক সেইভাবে প্যাটপ্যাট করে দেখছে দা কুনহাকে!

ক্যাপটেনের হুংকার শোনা গেল কানের কাছে–মারা গেল কী করে লোকটা?

পর্তুগিজ ভাষায় জবাবটা বুঝতে পেরেছিলেন হরয়েড। এত মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে নেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সামনের লোকটা? ক্যাপটেনের প্রশ্ন।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পর্তুগিজ ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। তারপরেই আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে সজোরে পা ঝাঁকুনি দিয়ে কী যেন ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। অদ্ভুতভাবে নাচানাচি করেছিলেন কিছুক্ষণ–যেন অদৃশ্য আতঙ্ককে পা দিয়ে পিষে ফেলতে চাইছেন। তারপর সরে গিয়েছিলেন পাশে। খুব দ্রুত। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সটান দেহে গটগট করে গিয়েছিলেন ক্যানোর সামনের দিকে উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা লোকটার পানে। হেঁট হয়ে দেখেছিলেন কিছুক্ষণ। যেন গোঙিয়ে উঠেছিলেন। কেবিনের মধ্যে পায়চারি করেছিলেন। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে তাঁর সেই ঘোরাফেরা নাকি রীতিমতো শিহরনময়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির স্বরে কথা বলেছিলেন ক্যাপটেনের সঙ্গে–একটু আগেই অত লাঞ্ছনার বাষ্পটুকুও ছিল না কণ্ঠস্বরে। সাময়িক শৃঙ্খলাবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন নিরুত্তাপ আচরণে।

দূরবিন চোখে লাগিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হলরয়েড। খোলা ডেকে একটি পিঁপড়েও আর নেই–বেমালুম অদৃশ্য! ডেকের তলায় ছায়ার মধ্যে কিন্তু যেন অগুনতি চোখ নজরে রেখেছে দা কুনহাকে।

ক্যানো বাস্তবিকই পরিত্যক্ত–বলেছিলেন লেফটেন্যান্ট। তবে পিঁপড়ে থুকখুক করছে বলে মানুষ নামানো সমীচীন হবে না। গানবোটে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দড়ির দিকেই এগিয়েছিলেন। নৌকোয় দাঁড়িয়েছিল নাবিকরা দরকার হলে হাত লাগাবে বলে।

দুরবিন কষে তন্নতন্ন করে ক্যানোটাকে দেখছিলেন হলরয়েড।

মনে হয়েছিল যেন খুব সূক্ষ্মভাবে বিরাট তোড়জোড় চলছে পুরো ক্যানোর মধ্যে। ইঞ্চিকয়েক লম্বা কয়েকটা হুকুমদার পিঁপড়েকে দেখলেন সাঁত করে সরে গেল একদিক থেকে আর-একদিকে অদ্ভুত বোঝা ঘাড়ে করে–বোঝাটা যে কী কাজে লাগবে, তা ঠাহর করেও ধরতে পারেননি হলরয়েড। খোলা জায়গা দিয়ে লাইন দিয়ে যাচ্ছে না মোটেই–যাচ্ছে আধুনিক পদাতিক বাহিনীর মতো ছড়িয়ে পড়ে। লড়াই আরম্ভ হল যেন। বেশ কিছু পিঁপড়ে ঘাপটি মেরে রইল মৃত ব্যক্তির জামাকাপড়ের মধ্যে। বাকি সবাই ঝাঁকে ঝাঁকে সুসংযত সৈন্যবাহিনীর মতো জড়ো হল ঠিক সেইদিকেই, যেদিকে এখুনি পা দেবেন লেফটেন্যান্ট।

হলফ করে বলেছেন হলরয়েড, স্বচক্ষে না দেখলেও তাঁর বিশ্বাস, একযোগে দা কুনহার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পিঁপড়েবাহিনী। আচম্বিতে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে সজোর পা ঠুকেছিলেন লেফটেন্যান্ট। হুল ফোঁটাচ্ছে পিঁপড়ে–পরিষ্কার করে বলেছিলেন ক্যাপটেনকে বিষম বিতৃষ্ণায়। চোখে-মুখে প্রকট হয়েছিল ক্যাপটেনের প্রতি আতীব্র ঘৃণা।

পরক্ষণেই ক্যানো থেকে ঠিকরে পড়েছিলেন জলে।

নৌকোর তিন নাবিক তাঁকে টেনে তুলেছিল জল থেকে–ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল গানবোটে।

কিন্তু মারা গিয়েছিলেন সেই রাতেই!

.

০৩.

ক্যাপটেন গেরিলো কঠোর প্রকৃতি সামরিক পুরুষ হতে পারেন, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ তো বটেই। জ্বরের ঘোরে মৃত্যুর আগে লেফটেন্যান্ট দা কুনহা তাঁকেই দায়ী করেছিলেন তাঁর ওই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য। প্রলাপের ঘোরে বলেছিলেন, ক্যাপটেনই খুন করল তাঁকে!

ক্যাপটেন মনে মনে তা উপলব্ধি করলেও মুখে তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু বৃশ্চিক দংশনের মতো কথাটা তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে পরের দিন। ছটফট করেছেন। আপন মনে বকেছেন। হলরয়েডকে সাক্ষী মানবার চেষ্টা করেছেন। তিনি কেন খুন করতে যাবেন দা কুনহাকে? তিনি কর্তব্য করেছেন, দা কুনহাকেও কর্তব্য করার অর্ডার দিয়েছেন। ক্যানোয় একজনকে উঠতে তো হতই।

কোনও জবাব দেননি হলরয়েড। জবাব দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। কেবিনে শোয়ানো রয়েছে দা কুহার বিষজর্জর মৃতদেহ। চোখের সামনে ভাসছে বিষপ্রয়োগে কুশলী শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো বৃহদাকার পিপীলিকাবাহিনীর আক্রমণের দৃশ্য। চক্ষুষ্মন তারা, বুদ্ধিমানও বটে।

দা কুনহার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিষের জ্বালায়মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ক্যাপটেন। হলরয়েডকেও প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিরুত্তর থেকেছেন হলরয়েড। দূর বনভূমি থেকে ভেসে এসেছে বাঁদরদের কিচিরমিচির আর ব্যাঙেদের বিকট হল্লাবাজি। কানের ওপর সেই অত্যাচার আরও বিমর্ষ করে তুলেছে।

মনকে। কিছুতেই ভুলতে পারেননি ভয়াবহ সত্যটুকু–পিঁপড়েগুলোর চোখ আছে, ব্রেনও আছে। পরিধেয় ব্যবহারে অভ্যস্ত, ধাতব সামগ্রী নির্মাণে দক্ষ এবং বিষপ্রয়োগের হাতিয়ার উৎপাদনেও চৌকস। বৃহদাকার পিঁপড়েদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম, কোমরে বেল্ট, কাঁধে অদ্ভুত বোঝা–কী সেই বোঝা? বিষ ছুঁড়ে দেওয়ার অস্ত্র নিশ্চয়। বিষটাও নিশ্চয় বানিয়ে নিয়েছে। নইলে–

আচম্বিতে ক্ষিপ্তের মতো একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন গেরিলো। ক্যানোটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার কী? পুড়িয়ে ফেলা হোক।

দড়ি কেটে, কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পিপীলিকা বোঝাই ক্যানো। আগুনের আভায় প্রদীপ্ত হয়েছিল দুপাশের বনভূমি। রহস্য থমথমে অন্ধকারের মধ্যে অজস্র চক্ষু যেন নির্নিমেষে দেখেছিল, জলের মধ্যে ভাসমান জ্বলন্ত ক্যানোয় পুড়ে মরছে কাতারে কাতারে পিঁপড়ে–চক্ষুষ্মনদেরই সগোত্র!

সারাদিন সারারাত অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন গেরিলো। কী যে করবেন, কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেননি। হলরয়েডকে জিজ্ঞেস করেছেন, হলরয়েডও জবাব দেননি। পরের দিন সকালবেলা দেখেছেন, বিনিদ্র রজনি যাপন করে অর্ধোন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছেছেন গেরিলো। অদূরে দেখা যাচ্ছে বাদামা। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর, লতায় ঢাকা চিনিকল, গুঁড়ি আর বেতের ছোট্ট জেটি। উষ্ণ প্রভাতে কিন্তু নিথর নিস্পন্দ সবকিছুই। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। মানুষ তো নেই-ই। খাঁ খাঁ করছে বাদামা। পরিত্যক্ত। একটা নরকঙ্কাল দেখা যাচ্ছে তীরভূমিতে। সাদা ধবধবে। মাংস পরিষ্কার। শুধু হাড়গুলো রয়েছে। পড়ে।

গেরিলো উচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অকস্মাৎ। পরপর দুবার বংশীধ্বনি করেও সাড়া না-পাওয়ায় ঠিক করেছিলেন, একাই নেমে গিয়ে দেখে আসবেন। এতগুলো মানুষকে বিষ আর বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা অন্যায়।

মনে মনে সায় দিয়েছিলেন হলরয়েড। মুখে কিছু বলেননি। চোখে কিন্তু দেখেছিলেন, নদীর ধারে সারি সারি চক্ষুষ্মন পিপীলিকার খর-নজর রেখেছে গানবোটের ওপর। দূরে দূরে কুটির আর শুগার মিলের পাশে অদ্ভুত আকারে মাটির ঢিপি আর প্রাচীরও দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যেন সম্পূর্ণ। বাদামা যাদের দখলে, তারা ওত পেতে রয়েছে নতুন হানাদারদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়।

তাই মত পালটে নিয়েছিলেন গেরিলো। কামান ব্যবহারে বড় কৃপণ ছিলেন গোড়া থেকেই, বারুদ খরচ করতে চাইতেন না কোনওমতেই। সেদিন কিন্তু হুকুম দিয়েছিলেন কামান দাগতে। গুরুগম্ভীর গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল নিস্তব্ধ অরণ্য। মহা আড়ম্বরে উপর্যুপরি গোলা নিক্ষেপ করে গিয়েছিলেন গেরিলো। ধসে পড়েছিল শুগার মিল, উড়ে গিয়েছিল জেটির পেছনকার গুদামঘর।

অবশেষে বুঝেছিলেন, বৃথা চেষ্টা। গোলার অপচয়ই হচ্ছে শুধু–শনিধন আর হচ্ছে না। বাদামাকে আবার দখল করা যাবে না এভাবে। আবার শুরু হয়েছিল অস্থিরতা। সিদ্ধান্ত নিতে না-পারার যন্ত্রণায় যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। শয়তানের বাচ্চাদের কামান দেগে ধ্বংস করা যাবে না। ফিরেই যেতে হবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করে তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

তাই ফিরে এসেছিল গানবোট। অনেকটা পথ এসে তীরভূমিতে কবরস্থ করা হয়েছিল দা কুনহাকে।

এমন একটা জায়গায়, যেখানে নতুন শ্রেণির এই পিঁপড়েরা এখনও পৌঁছায়নি।

তিন হপ্তা আগে টুকরো টুকরোভাবে পুরো বিবরণটা শুনেছিলাম হলরয়েডের মুখে।

বিশেষ এই পিঁপড়েদের মস্তিষ্ক আছে। আর দেরি করা উচিত নয়। মহাবিপদ আসন্ন বদ্ধমূল এই ধারণা নিয়েই ইংল্যান্ডে ফিরেছেন হলরয়েড। বুদ্ধিমান এই পিপীলিকাবাহিনী আপাতত যেখানে সক্রিয়, ব্রিটিশ গুয়ানা সেখান থেকে এক হাজার মাইলের মধ্যেই। কাজেই এখন থেকেই হুঁশিয়ার না হলে ব্রিটিশ গুয়ানার যে কী হাল হবে, তা ভাবতেও গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

নারকীয় এই কীটদের যে আর উপেক্ষা করা সমীচীন নয়, ব্রাজিল সরকার তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে পাঁচশো পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে মোক্ষম কীটনাশকের জন্যে। মাত্র তিন বছর আগে অজেয় এই কীট আবির্ভূত হয়েছিল অনতিদূরে পাহাড়ের ওপরে। এর মধ্যেই তাদের বিজয়-অভিযান রীতিমতো বিস্ময়কর। বাতেমো নদীর দক্ষিণ তীরভূমির প্রায় ষাট মাইল জায়গা তাদের পুরো দখলে। মানুষকে একেবারেই তাড়িয়ে ছেড়েছে, অথবা খতম করেছে। জায়গা-জমি, বাড়িঘরদোর, কলকারখানায় ঘাঁটি গেড়েছে।

একটা জলপোতও দখলে এনে ফেলেছিল। অব্যাখ্যাত পন্থায় কাপুয়ানা শাখানদীর ওপর সেতু রচনা করে অ্যামাজনের ভেতরে বহু মাইল পথ নাকি এগিয়ে এসেছে। সাধারণ

পিঁপড়েদের মতো তারা নয়, ঢের বেশি সংঘবদ্ধ এবং সমাজবদ্ধ। অন্য পিঁপড়েদের সমাজ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু এরা একত্র হয়ে একটা জাত গড়ে তুলেছে। বুদ্ধিমত্তার শেষ এখানেই নয়, ভয়াবহতা প্রকটতর হয়েছে বিষপ্রয়োগের নৈপুণ্যে। বৃহদাকার শত্রুকে বল প্রয়োগে বধ করে না–করে বিষপ্রয়োগে। বিষটা সাপের বিষের মতোই মারাত্মক। খুব সম্ভব উৎপাদনও করে নিজেরা। ওদেরই মধ্যে আয়তনে যারা বড়, তারা ছুচের মতো তীক্ষ্ণাগ্র ক্রিস্টাল বয়ে নিয়ে যায় মানুষের মতো বড় শত্রুদের গায়ে বিঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে।

বিশ্ববাসীকে সজাগ করার মতো বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। চাক্ষুষ বর্ণনা পাওয়া গেছে কেবল হলরয়েডের কাছ থেকেই। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে যেটুকু বলেছেন, চমৎকৃত এবং হুঁশিয়ার হওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। ঊর্ধ্ব অ্যামাজনে ক্রমশ কিংবদন্তির আকারে ছড়িয়ে পড়ছে অসাধারণ এই পিঁপড়েদের অত্যাশ্চর্য কীর্তিকলাপ–কল্পনার আতঙ্ক মিশ্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম অতিরঞ্জিত কাহিনি। বিচিত্র এই পোকারা নাকি বিবিধ হাতিয়ারের ব্যবহার জানে, আগুনের ব্যবহার জানে, ধাতুর ব্যবহার জানে, যন্ত্রবিদ্যাও জানে। তাই পারাহাইবার নদীর তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছে অদ্ভুত কৌশলে লন্ডনের টেমস নদীর মতোই চওড়া সেই নদী অতিক্রম করেছে পাতাল-বিবর দিয়ে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি সঞ্চিত থাকে মানুষের মতোই পুঁথি আর নথির মধ্যে–সঞ্চিত বিদ্যেকে কাজে লাগায় প্রয়োজনমতো। আপাতত তারা শুধু অগ্রসর হচ্ছে বিরামবিহীনভাবে এবং পথে মানুষ পড়লেই খতম করে দিচ্ছে নির্দয়ভাবে। বংশবৃদ্ধিও ঘটছে দ্রুতহারে। হলরয়েডের ধ্রুব বিশ্বাস, অচিরেই পুরো নিরক্ষীয় দক্ষিণ আমেরিকা এসে যাবে তাদের আধিপত্যে।

কিন্তু শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই বিজয়কেতন উড়িয়ে তারা ক্ষান্ত হবে, এমন কথা কে বলতে পারে? যে গতিবেগে এগচ্ছে, ১৯১১ সাল নাগাদ হানা দেবে কাপুয়ারানা এক্সটেনশন রেলপথে–ইউরোপের ধনকুবেরদের টনক নড়বে তখনই।

১৯২০ নাগাদ পেরিয়ে আসবে অ্যামাজনের অর্ধেক। আমার তো মনে হয়, ১৯৫০ কি ১৯৬০-এর মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলবে ইউরোপকে।